

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

National Integrity Strategy of Bangladesh

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: কি এবং কেন?

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা।

দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত ‘বাংলাদেশ’ উল্লিখিত মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ‘মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ’ রাষ্ট্র-পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ‘অনুপার্জিত আয়’কে সর্বতোভাবে বন্ধ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া এই দেশ ও জাতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ‘রূপকল্প ২০২১’-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ‘এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা’ হবে, ‘যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত’ হবে।

সরকার বিশ্বাস করে যে, এই সব লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য, এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বহুবিধ আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একটি কৌশল-দলিল হিসাবে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত মূল বিষয়

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত এই কৌশলপত্রটিতে গুরুত্বপূর্ণ ‘রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয়’ প্রতিষ্ঠানসমূহের পদ্ধতিগত সংস্কার, তাদের কাজ, কর্মপ্রক্রিয়া এবং দক্ষতার উন্নয়ন কৌশল এবং সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রটিতে একটি সুসমন্বিত ও সুসংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শুদ্ধাচারকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে; সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পেশায়শাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শসভা আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে; মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য অংশীজনের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। কৌশলপত্রটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে দলিলটির কাঠামো ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেসব মতামত ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেগুলির আলোক সার্বিকভাবে এই দলিলটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিগত ১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কৌশলপত্রটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রণীত আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থা

২০০৮ সালের নির্বাচনে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের’ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছিল। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বর্তমান সরকার সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত তিন বছর নয় মাসে সরকার ১৮০ টি আইন ও ৩৩টি কর্মকৌশল ও নীতি প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ‘সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯’, ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯’, ‘সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯’, ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯’, ‘চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০’, ‘জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১’, ‘মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২’, ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২’, ‘প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২’, ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এসব আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। সেইসঙ্গে এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মধারা নির্ধারণও জরুরি হয়ে পড়েছে। এই শুদ্ধাচার কৌশলটি সে লক্ষ্যেই গৃহীত একটি উদ্যোগ। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ভবিষ্যৎ-কৌশল চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নে এই কৌশল-দলিলটি সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের কনভেনশন- এর লক্ষ্য অর্জনে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ এর প্রয়োগ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ‘ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে’ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে। এই কনভেনশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র তার আইন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী কার্যকর এবং সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন করবে যা সমাজের অংশগ্রহণকে উন্নত করবে এবং আইনের শাসন, জনসম্পদ এবং জনসংযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি-নীতির প্রতিফলন ঘটাবে।’ (অনুচ্ছেদ ৫.১)। এই প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দলিলে বিধৃত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ জাতিসংঘের উল্লিখিত কনভেনশন ও পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত একটি সমন্বিত কৌশল।

‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ অনুসারে ‘শুদ্ধাচার’ এর ধারণা

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি- পর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই ‘প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার’ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

(ক) সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি নির্মূল ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজ তা প্রতিপালন করে; সেইসঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা ও মূল্যবোধও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কের জটাজালে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানগত শুদ্ধাচার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাও জরুরি। এই কৌশলটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তিমানুষের শুদ্ধাচার, অন্য কথায় চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর হাতিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র, বেসরকারি

ব্যবসা খাত ও সুশীল সমাজের যেসব প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে; শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির উন্নয়ন সাধন, ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন, লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন, এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এ দলিলটিতে।

(খ) একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে এবং শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার পরের ধাপে আছে শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান; নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচারের কৌশলে এগুলির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই কৌশলটির মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত – আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের কর্মবৃত্তে যথাক্রমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্বাহীকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি পালন সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনে ক্ষমতাবান। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং ‘সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ’ হিসাবে অভিহিত। যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে- ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই বিবেচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তেমনই রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

(অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

1. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
2. জাতীয় সংসদ
3. বিচার বিভাগ
4. নির্বাচন কমিশন
5. অ্যাটার্নি জেনারেল
6. সরকারি কর্ম কমিশন
7. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
8. ন্যায়পাল
9. দুর্নীতি দমন কমিশন
10. স্থানীয় সরকার

(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

1. রাজনৈতিক দল
2. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
3. এনজিও ও সুশীলসমাজ
4. পরিবার
5. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
6. গণমাধ্যম

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। এগুলিতে পদ্ধতিগত সংস্কারও সাধন করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে এসব কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এগুলির একটি সম্মিলিত রূপ প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে – এই কৌশলটিতে সে উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের কৃত্য, কৃতি, বিবর্তন, বর্তমান অবস্থা ও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা বিধৃত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়নকাল হিসাবে স্বল্পমেয়াদ (এক বছরের মধ্যে), মধ্যমেয়াদ (তিন বছরের মধ্যে) এবং দীর্ঘমেয়াদ (পাঁচ বছরের মধ্যে) চিহ্নিত করা করা হয়েছে। এই দলিলটিকে নীতিগতভাবে একটি বিকাশমান দলিল হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং এতে সময়ের বিবর্তনে এবং প্রয়োজনের নিরিখে নতুন সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকে কার্যক্রম (intervention) চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
--------	-----------	------------------	------	----------	-------------

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল- এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য (Vision and Mission)

রূপকল্পঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

অভিলক্ষ্যঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

এই কৌশলটির রূপকল্প (vision) হচ্ছে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। বাংলাদেশ ও তার সংগ্রামী মানুষের এটিই হল কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে তা-ই প্রত্যাশিত। শুদ্ধাচার কৌশলকে এ প্রত্যাশা পূরণের একটি অবলম্বন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ ও জাতির পিতার স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল- এর বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনকানুন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির একটি বহুধাবিস্তৃত ও সম্মিলিত রূপ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রস্তাবও করা হয়েছে এতে। মূলত নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই এই শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হবে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি অঙ্গ – বিচার বিভাগ এবং আইনসভা এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। কৌশলটিতে চিহ্নিত কার্যক্রম সময়নির্ধারিত, কিন্তু শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কোন সময়ের পরিসরে সীমিত নয়; সুতরাং এই কৌশলও অব্যাহতভাবে উন্নত ও পরিশীলিত করতে হবে; এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

‘শুদ্ধাচার কৌশল’টি বাস্তবায়নের জন্য একটি ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’ গঠন করা হবে। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু’বার সভায় মিলিত হবে এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এবং এ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এই কৌশল- দলিলটির আওতায় চিহ্নিত কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকৃতভাবে বাস্তবায়িত হবে। এতে চিহ্নিত

দায়িত্বপালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাতে সহায়তা প্রদান করবে। প্রতি মন্ত্রণালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং পরিবীক্ষণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে এবং সার্বিকভাবে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিতকরণের জন্য 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রবর্তন করা হবে। সেই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, তাদের জন্য সরকার বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কার সাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১'-এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সরকার এই 'শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায় যে, সোনার বাংলা গড়ার পথে এই কৌশল ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২ তে প্রকাশিত “সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল” শীর্ষক প্রজ্ঞাপণ অনুসরণে লিখিত।